Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-2, Issue-iv, published on October 2022, Page No. 01–11
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

মহাভারতের প্রধান প্রধান কয়েকটি নৈসর্গিক দৃশ্য এবং বাঙালি কবিগণের অনুবাদের স্বতন্ত্রতা

ড. লতিফ উদ্দীন
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
চাপড়া সরকারি মহাবিদ্যালয়, চাপড়া, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ
ই-মেইল : uddin231496@gmail.com

Keyword
প্রকৃতি সান্নিধ্য, অনুবাদক বাঙালি, অনুবাদের বিশিষ্টতা, নির্বাচিত অনুবাদক, নৈসর্গিক দৃশ্য, প্রকৃতির উদ্দীপন বিভাব, বৈচিত্র্যময় প্রকৃতি সত্তা, তুলনামূলক আলোচনা, প্রকৃতি সংহার।

Abstract
মহাভারতের প্রধান চারজন বাঙালি অনুবাদক কাশীরাম দাস, শংকর কবিচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, রাজশেখর বসুর অনুবাদে নিসর্গ যে স্বতন্ত্রতা বজায় রেখেছে তা আমরা প্রধান প্রধান কয়েকটি নৈসর্গিক দৃশ্যকে অবলম্বন করে নিরীক্ষণ করব এই প্রবন্ধে। মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে এসে সুপ্রাচীন কালে রচিত ব্যাসদেবীয় নিসর্গ কতটা রক্ষিত বা পরিবর্তিত হয়েছে তা মধ্যযুগের দুই অনুবাদক কাশীরাম ও কবিচন্দ্র এবং আধুনিক যুগের দুই অনুবাদক কালীপ্রসন্ন ও রাজশেখর বসুর অনুবাদেকে সামনে রেখে তুলনামূলক আলোচনা করব। মহাকাব্যিক ধ্রুপদীয়ানার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মহাভারতের নিসর্গ যেমন কাঠিন্যতা প্রকাশ করেছে তেমনি মধুর শান্ত কোমল প্রকৃতিরও অভাব এখানে নেই। উদ্দীপন বিভাব রূপে নিসর্গের যে সাধারণ ভূমিকা তা যেমন দেখব তেমনি বহিঃপ্রকৃতি ও মনোপ্রকৃতির সংযোগ যা চিরকালীন সাহিত্যের লক্ষণ তাও লক্ষিত হবে ব্যাস থেকে অনুবাদকদের কলমে। নিসর্গ অনেক ক্ষেত্রেই একটা স্বাধীন সত্তা স্বরূপ ঘটনা ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। প্রকৃতি সংযোগ যেমন এখানে আছে তেমনি রয়েছে প্রকৃতি সংহার। সব মিলিয়ে নিসর্গের বিবিধ বৈচিত্র্যময় রূপ ও ভূমিকা আলোচিত হয়েছে এই প্রবন্ধে।

Discussion
মহাভারতে পাওয়া যায় না এমন কোন কিছুই নেই,তবুও নিসর্গপ্রকৃতির অনুষঙ্গ অন্বেষণে অনেক্ষেত্রেই আমরা রামায়ণের দ্বারস্থ হই।হতে পারে যুদ্ধক্ষেত্রের ভয়াল ভীষণ প্রাঙ্গণে মধুর শান্ত কোমল প্রকৃতির অবস্থান বিরল জেনেই আমাদের এমন উপলব্ধি। এইখানেই মহাকাব্য রূপে মহাভারত বিশিষ্টতম আর এর নির্সগ অদ্ভুত বৈচিত্র্যময়, কঠিনে কোমলে গড়া। যুদ্ধক্ষেত্রের ভয়ংকর রূপ, দাবানল, অগ্নিসংযোগের পাশাপাশি অরণ্যের শান্ত পরিবেশ, সরস বসন্ত ঋতু, বৃক্ষশাখায় পুষ্পের

মঞ্জরী, বসন্তের মৃদু বাতাস, আমগাছে কোকিলের কুহুরব ইত্যাদির প্রসঙ্গ মহাভারতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে অনন্যতা দিয়েছে। একই সাথে ক্লাসিকাল ও রোমান্টিক সাহিত্য ধারার প্রতিভূ স্বরূপ অনন্য সৌন্দর্য সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে। মহাভারতে নাগরিক জীবনের চিত্র অপ্রতুল নয়, কৌরব-পাণ্ডবের রাজধানী হস্তিনাপুর; কিন্তু মহাভারতকার ব্যাসদেব আশ্রমবাসী। রাজধানী থেকে অদূরে অরণ্যের শান্ত নিসর্গ পরিবেশে তাঁর অবস্থান। এহেন ব্যাসদেব মহাভারতের তাৎপর্য দুটি বিখ্যাত শ্লোকে বলেছেন -

"যুধিষ্ঠিরো ধর্মময়ো মহাদ্রুমঃ,
স্কন্ধোহর্জুনো ভীমসেনোহস্য শাখাঃ।
মাদ্রী সুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে,
মূলং কৃষ্ণ ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ।।"
(১। ১। ৭২, ৫। ২৯। ৫৩) (ঋণ– মহাভারত কথা, স্বামী তথাগতানন্দ, মহাভারতের মর্মবাণী, পৃষ্ঠা-ঞ)

এই ধর্মময়ো যুধিষ্ঠিরের বিপরীতে অহংকারী দুর্যোধনকে ব্যাসদেব যেভাবে এঁকেছেন-

"দুর্যোধনে মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ,
স্কন্ধঃ কর্মঃ শকুনিস্তস্য শাখাঃ।"
দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে
মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোহমনীষী।।"[১]

স্পষ্টতই পিতামহ ব্যাসদেব দুর্যোধন এবং যুধিষ্ঠিরের তফাৎ করতে বসে বৃক্ষের প্রসঙ্গ এনেছেন। একজন অহংকারী অন্যজন ধর্মময় সুতরাং এ দুয়ের বিবাদ অনিবার্য। কিন্তু নিরীক্ষণ করার বিষয় হল তিনি অরণ্যের নিকটজন বলেই বৃক্ষকে মানুষের উপমায় ব্যবহার করতে পেরেছেন সহজেই। ব্যাসদেবেরই সন্তান ধৃতরাষ্ট্র,পাণ্ডু এবং বিদুর। যুধিষ্ঠিরের বিপদে ব্যাসদেব তাদের বনবাসস্থলে হাজির হন ও অরণ্যের উদারতায় তাদের রক্ষা করেন। তাঁর বাসস্থান বদরিকাশ্রম– নানা বৃক্ষের ছায়ার ঘেরা, খাদ্য প্রকৃতিদত্ত ফল, শান্ত নিসর্গ পরিবেশে সর্বদাই তিনি উদ্বেগহীন। কেবলমাত্র রচয়িতা ব্যাসদেব নয় মহাভারতের অন্যান্য চরিত্রগুলিরও ব্যাপ্তি প্রকৃতি সান্নিধ্যে প্রসারিত হয়েছে তা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। জন্মলগ্ন থেকে প্রকৃতির সংস্পর্শে পেয়েছে পাণ্ডব ভ্রাতারা আবার তাঁদের দিয়েই মহাকাল ভারত সাম্রাজ্যকে নতুন করে গড়তে চান বলেই যেন তাদের অরণ্যে প্রবেশ। যে অরণ্যবাস তাঁদের দিয়েছে জীবন সম্পর্কে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী। 'মহাভারত-কথা' গ্রন্থে স্বামী তথাগতানন্দ বলেছেন –

"প্রাচীন ভারতের প্রজ্ঞাদৃষ্টি এসেছিল আরণ্যক জীবনের স্বাধীনতায় ও প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কে। সেইজন্যেই পাণ্ডবদের জীবন এই অরণ্য-বিদ্যালয়ের স্নিগ্ধ পরিবেশে মুনিগণের সাহচার্যে ও তপস্যায় গড়ে উঠে।তাদের লাভ হয় জীবন সম্বন্ধে একটা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী।"[২]

অতএব নিসর্গপ্রকৃতিও যে মহাভারতের অন্যতম সম্পদ তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা, দ্বৈপায়ণ ব্যাসের কথা থেকেই বলতে হয়; "মহাভারতে যা নেই তা অন্য কোথাও নেই" (আদিপর্ব,২/৩৯০, শ্লোক)

মহাভারতের অসীম ঐশ্বর্য, এর মহত্ত্ব ও ভারবত্ত্বের জন্যে কুরুকুলের তথা ভারতবংশের মহনীয় এই চরিত-কথা ববরাবই আপামর মানব সমাজকে আকর্ষণ করেছে প্রবলভাবে। ফলতঃ ব্যাসকৃত গ্রন্থটির অনুবাদ হয়েছে বিভিন্ন ভাষায় সারা বিশ্ব জুড়ে। কথিত আছে একজন মুসলমান শাসকের গল্প তৃষ্ণাকে শান্ত করতে গিয়েই মহাভারতের বাংলা অনুবাদের সূচনা। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে আমরা দেখব পঞ্চদশ শতক থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত সঞ্জয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, কাশীরাম দাস, শংকর কবিচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, রাজশেখর বসু, অনেকেই মহাভারতের আংশিক কিংবা পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করেছেন, তালিকা সম্পূর্ণ করা প্রায় অসম্ভব, বর্তমান প্রবন্ধে আমরা সেই চেষ্টা করবও না। কিন্তু এই বিস্তৃত অনুবাদ কর্মে মহাভারতের মূল ঘটনাক্রম বজায় থাকলেও অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি, সংযোজন বিয়োজন ঘটেছে। অধুনা পুণের ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট সংস্কৃতে মহাভারতের মান্য সংস্করণ বা 'ক্রিটিকাল এডিসন' প্রকাশ করেছে। আনন্দের বিষয় দিল্লীবাসী বাঙালি অর্থনীতিবিদ বিবেক দেব রায় এই মান্য সংস্করণ ইংরাজীতে অনুবাদ

করে আমজনতার কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন। মোট কথা পঞ্চদশ শতক থেকে যে মহাভারতের অনুবাদের ধারার সূচনা হয়েছিল বাঙালি আজও তা বজায় রেখেছে। মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদে এর আগেও অবশ্য বাঙালি তার অবদান রেখেছে। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভন বুটানেন এই কারণেই মহাভারত অনুবাদ করতে গিয়ে বলেছিলেন -

"Bengali cosmopolitanism that likes to share its heritage with the rest of the world."[৩]

অনুবাদের ধারার সুফল অনেক। সময় ও যুগের পরিবর্তনের সাথে কবিদের নিজস্ব জীবন দর্শন যেমন লক্ষিত হয় তেমনি সমকালীন সমাজ ও জীবনের ছায়াপাত ঘটে অনূদিত সাহিত্যে যা অনুবাদকে অনেকটাই ভিন্নতা দেয়।মূলত সপ্তদশ শতকের কবি কাশীরাম দাস, অষ্টাদশ শতকের কবি শংকর কবিচন্দ্র, আধুনিক যুগের কালীপ্রসন্ন সিংহ ও রাজশেখর বসুর অনুবাদ নিয়ে আমাদের তুলনামূলক আলোচনা। উল্লেখিত অনুবাদগুলিতে বিভিন্ন ঘটনা অনুসারী নিসর্গ প্রসঙ্গগুলি যুগ, কবি, লেখক ভেদে কতটা পরিবর্তিত হয়েছে তা আমরা দেখব। আমাদের লক্ষ্য হল ব্যাসদেবের অঙ্কিত কয়কটি ঘটনায় নিসর্গের যে রূপ চিত্রিত হয়েছে তা নিরীক্ষণ করা। নিসর্গ এখনানে কেবল উদ্দীপন বিভাব হয়ে থাকেনি তা ঘটনা প্রবাহকেও নিয়ন্ত্রণ করেছে, প্রকাশিত হয়েছে তার স্বধীন সত্তা। মধ্যযুগের অনুবাদকদের কলমের প্রকৃতি বর্ণনায় এসেছে আধুনিকতার ছোঁয়া, বিশেষত উনবিংশ শতকের অনবাদে। প্রকৃতিকে দিয়ে কার্য সাধন করার প্রয়াসও লক্ষ্য করা যায়, যখন দেখি ধৃতরাষ্ট্র বারণাবতকে মধুর প্রকৃতিময় স্থান রূপে পাণ্ডবদের কাছে বর্ণনা করেন তাদের প্রলুব্ধ করে ওখানে পাঠানোর জন্য যদিও উদ্দেশ্য ছিল তাদের পুড়িয়ে মারা। আবার জয়দ্রথ হত্যায় যুদ্ধাস্ত্র হয়েছে প্রকৃতি।পাশাপাশি বহুকাল পরে অনূদিত বাংলা মহাভারতগুলিতে স্বাভাবিকভাবেই বাঙালি স্বভাবের প্রতিফলন ঘটেছে। বাঙালি ভোজ্য, বেশ-ভূষা, আচার-আচরণ, রীতিনীতি, বাঙলার ঋতু, ফুল-ফল, বৃক্ষ-অরণ্য, পর্বত-নদী তার মধ্যে প্রবেশিত হয়েছে। আমরা মূলত আলোচনায় নিয়ে আসব কয়েকটি প্রধান প্রধান ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নৈসর্গিক দৃশ্য সেই সঙ্গে ব্যাস ও বিভিন্ন অনুবাদকদের তুলনামূলক অলোচনায় উদ্ভাসিত হবে নিসর্গের বিবিধ স্বতন্ত্র সত্তা, যথা -

শকুন্তলার উপাখ্যান (আদি পর্ব) : প্রকৃতির মধুর রূপ, প্রেমের উদ্দীপকরূপে প্রকৃতি, ঘটনা প্রবাহের নিয়ন্ত্রক প্রকৃতি, অরণ্যের নৈসর্গিক পার্থক্য, পটভূমি গঠনকারী প্রকৃতি, সর্বভারতীয় বৃক্ষ এবং বঙ্গজ বৃক্ষ শ্রেণি।

খাণ্ডববন দাহন (আদি পর্ব) : মিথ-পুরাণ, অরণ্য সংহার, নগর বিস্তার, দহন চিত্র, অনুবাদকদের বর্ণনার ভিন্নতা।

কুরুক্ষেত্র বর্ণনা (উদ্যোগ পর্ব) : যুদ্ধক্ষেত্রের ভয়ঙ্কর নিসর্গ, কৃষিকাজের ছবি, পাখির জীবন কাল।

জয়দ্রথ বধ (দ্রোণ পর্ব) : সূর্য গ্রহণের ছবি, মহাজাগতিক নিসর্গ, যুদ্ধাস্ত্র রূপে নিসর্গের ব্যবহার।

শকুন্তলার উপাখ্যান :

বাঙালির কাছে দুষ্মন্ত – কণ্ব - শকুন্তলা – অনুসূয়া – প্রিয়ংবদা - ভরতের কাহিনি ব্যাসদেবের মহাভারতের চেয়ে কালীদাসের 'অভিজ্ঞানম শকুন্তলম' নাটকের সাহায্যে বেশি পরিচিত। এখানে তপোবন, অরণ্য, মালিনী নদী ইত্যাদী গুরুত্বপূর্ণ নৈসর্গিক পটভূমিকা। কাশীরাম দাস এই অংশে মনোরম প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। কণ্ব মুনির আশ্রমের লতা ফুল ফলের সমারোহ, নদীর শান্তগতি, কেবল মানুষ নয় হিংস্র পশুরাও যার প্রভাবে কোমল স্বভাব প্রাপ্ত হয়েছে –

"নানা জাতি বৃক্ষ তথা ফুল ফল ধরে।
নানা জাতি পক্ষী তথা সদা কেলী করে।।
মধুচক্র ডালে ডালে আছে তরুগণে।
বায়ু তেজে পুষ্প বৃষ্টি হয় অনুক্ষণে।।"৪

প্রকৃতি এখানে পরম যত্নে সাজিয়ে রেখেছে প্রেমের সম্পদ, দুষ্মন্ত শকুন্তলার প্রেমের সূচনা এমন পরিবেশে হবে না তো কোথায় হবে? প্রকৃতি এখানে কেবল উদ্দীপন বিভাব হয়ে থাকেনি সে ঘটনা ধারাকে নিয়ন্ত্রণও করেছে। আমরা দেখি শকুন্তলার জন্মপ্রসঙ্গে যখন ইন্দ্র বিশ্বামিত্র মুনির ধ্যান ভাঙানোর জন্যে মেনকাকে পাঠান তখন অসীম শক্তিধর ঋষিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রকৃতি সাধ্যমত সাহায্য করেছে –

"হেমন্ত পর্বতে বসে সেই মুনিবর।

মুনি দেখি মেনকার কাঁপিল অন্তর।।
অতিশয় সুবেশা হইয়া বিদ্যাধরী।
মুনির নিকট ক্রীড়া করে মায়া করি।
হেনকালে বায়ুবহে অতি ঘরতর।
উড়াইয়া বস্ত্র তার ফেলিল অন্তর।।"[৫]

পূর্ণাঙ্গ মহাভারতের আধুনিক ও গদ্য অনুবাদক কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর অনুবাদে আর একটু অগ্রসর হয়ে প্রকৃতিকে এখানে ঘটনার পটপরিবর্তনের সঙ্গে একাত্ম করেছেন। এই অংশে বিশ্বামিত্র যেন নিসর্গের অধিপতি। তিনি নিজেই একটা নক্ষত্রলোক ও নক্ষত্র সমুদায় সৃষ্টি করেছেন। নিজের সুবিধার্থে এক আধঃসলিলা মহানদীকে আশ্রমের নিকটে এনেছেন। তাঁর পদভারে মেদিনী কম্পিত হয়। তিনি সমগ্র সুমেরু পর্বতকে উৎক্ষেপণ এবং দশদিকে ঘোরাতে পারেন।এমন ক্ষমতাশালী ঋষিকে প্রকৃতি ছলনা করেছে! প্রকৃতি যে আপন খেয়ালে চলে তা বোঝতেই যেন উপাখ্যান –

"অনন্তর পিতা সেই ঋষিকে কহিলেন, ইন্দ্র মেনকার প্রার্থনাসুরে বায়ুকে আদেশ করাতে বায়ু মেনকার সহিত মহর্ষি বিশ্বামিত্রের আশ্রমে গমন করিলেন। ...বায়ু অবসর বুঝিয়া তাহার পরিধেয় বস্ত্র হরণ করিয়ে দূরে নিক্ষেপ করিল। মেনকা সাতিশয় হইয়া বসন আনয়নার্থে দ্রুতপদে গমন করিতেছে। এমন সময় অগ্নিসম তেজস্বী মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাহাকে তদবস্থান্বিতা দেখিলেন এবং তাহার রূপলাবণ্য দর্শনে কন্দর্পশরে জর্জরিত হৃদয় হইয়া নিকটে আহ্বান করিলেন।"[৬]

এই উপখ্যানের পরবর্তী পর্যায়ে কালীপ্রসন্ন দুষ্মন্তের মৃগয়াকালীন অরণ্যের যে বিবরণ দিয়েছেন সেই অরণ্য এবং কণ্বমুনির আশ্রমস্থিত অরণ্য সম্পূর্ণ পৃথক। প্রকৃতির পটপরিবর্তনকে অনুবাদক আধুনিক নাটকের মঞ্চনির্মাণের মতোই ঘটনা প্রবাহের পূর্ব ইঙ্গিতকারী হিসাবে ব্যবহার করেছেন। কালীপ্রসন্নের অনুবাদে বিবরিত দুষ্মন্তের মৃগয়াকালীন এই অরণ্য অনেক গহন, বিল্ব, অর্ক, কপিত্থ, ধব, খদির প্রভৃতি বৃক্ষে ঘেরা। এখানে কোথাও কোন স্থানেই জল নেই, মানুষ নেই, সিংহ, শার্দূল, বরাহ প্রভৃতি হিংস্র পশুর অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র। এ অরণ্যে মৃগয়া করতে করতে দুষ্মন্ত অন্য এক বনে প্রবেশ করলেন, সে বন সম্পুর্ণ অন্য এক জগৎ পুষ্পিত বৃক্ষের সমারোহে কোকিলের কুহুতানে মধুর মনোরম পরিবেশ তৈরি হয়েছে এখানে। বোঝাই যাচ্ছে এ অরণ্য দুষ্মন্তের মনোজগতে প্রভাব ফেলবে ও দুষ্মন্ত-শকুন্তলার প্রেমের পটভূমি নির্মাণ করবে-

"ঐ বন সুপুষ্পিত পাদপ সমূহে সমাকীর্ণ, সুকোল বালতৃণ দ্বারা আচ্ছাদিত ও বৃক্ষগণের শাখাছায়ায় আবৃত। উহার কোন স্থানে ময়ূর, পুংস্কোকিল প্রভৃতি নানাবিধ পক্ষিগণ সুমুধুরস্বরে কলরব করিতেছে; কোথাও বা ভ্রমরগণ ঝঙ্কার করিতে করিতে এক পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে বসিতেছে। ঐ বনে কোন বৃক্ষই ফলপুষ্পহীন বা কণ্টকাবৃত ছিল না এবং যে পুষ্পে ভ্রমর নাই এমন পুষ্পও ছিল না।"[৭]

বাংলা সাহিত্যে পরশুরাম ছদ্মনামে পরিচিত হাস্যরসের গল্পকার রাজশেখর বসুও তাঁর গদ্যে অনূদিত মহাভারতে কণ্বমুনির আশ্রমসমৃদ্ধির কথা বলেছেন তবে তা সংক্ষেপে, কিন্তু দুষ্মন্তের মৃগয়াকালীন অরণ্যের কোন বর্ণনা তিনি দেননি-

"ঐ বন অতি রমনীয়, নানাবিধ কুসুমিত বৃক্ষে সমাকীর্ণ এবং ঝিল্লী ভ্রমর ও কোকিলের রবে মুখরিত। রাজা মালিনী নদীর তীরে কণ্ব মুনির আশ্রম দেখতে পেলেন, সেখানে হিংস্র জন্তুরা শান্তভাবে বিচরণ করছে।"[৮]

স্মরণীয় রাজশেখর বসু এবং কালীপ্রসন্নের অনুবাদে শকুন্তলার রূপ বর্ণনা নেই যা আমরা দেখেছি কাশীরামের অনুবাদে।

প্রসঙ্গত বলতে হয় কালীপ্রসন্ন ব্যাস মহাভারতের অনুসরণে সর্বভারতীয় প্রকৃতির সঙ্গে সাজুজ্য রেখে বিল্ব, অর্ক, কপিত্থ, ধব, খদির, অশোক, চম্পক, চূত, বকুল, পাটল, অর্জুন, চন্দন, প্রভৃতির সঙ্গে পুন্নাগ, লকুচ, প্রাচীনামূলক, লোধ্র, অঙ্কোল, কজ্বক, অতিমুক্তক প্রভৃতি বৃক্ষের নাম এনেছেন। কাশীরাম একই সঙ্গে বঙ্গ প্রকৃতিরও বর্ণনা দিয়েছেন তাই তাঁর অরণ্য আম, জাম, কাঠাঁল, পলাশ, তাল, তমাল, পিপল, বেল, কদলী, নারিকেল, সুপারি গাছে পরিপূর্ণ।

খাণ্ডব দাহন :

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সীতা ও রাম কৃষিজ সৃষ্টি, তাই যবদ্বীপে রাম ও সীতা ভাই-বোন। মহাভারতে দেখি এই সভ্যতার বিকাশে কৃষ্ণের ভূমিকাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। খাণ্ডবপ্রস্থে ইন্দ্রপ্রস্থ স্থাপন করে কৃষ্ণার্জুন যমুনায় জল বিহার করত। একদিন

ব্রাহ্মণ বেশে অগ্নি, নিজের অগ্নিমান্দ্য দূর করার জন্য ব্রহ্মার নির্দেশে খাণ্ডববন দগ্ধ করে সেখানকার প্রাণীদের মেদ ভক্ষণ করে অজীর্ণ রোগ দূর করতে চাইল। এদিকে খাণ্ডববন ছিল দেবরাজ ইন্দ্রের প্রিয় জায়গা। নিসর্গ সন্তান হাজার হাজার হস্তি এবং সর্পকূল জল ছড়িয়ে সাত সাতবার অগ্নির অরণ্য ধ্বংস বন্ধ করে দেয়। পুরো খাণ্ডববন হয়ে ওঠে নিসর্গ রক্ষা এবং নিসর্গ ধ্বংসের পটভূমি। শেষে পনের দিন ধরে অগ্নি, কৃষ্ণার্জুনের সাহায্যে, এই খাণ্ডববন দহন করেন। অরণ্য ধ্বংসের এই নির্মম ঘটনা থেকে কেবল রক্ষা পায় ময়দানব, তক্ষকনাগের পুত্র অশ্বসেন ও চারটিমাত্র শার্ঙ্গক পাখি। মহাভারতের নিসর্গ ধ্বংসলীলার বাস্তব চিত্র এঁকে ব্যাস ও তাঁর অনুবাদকরা প্রকারন্তরে নিসর্গ রক্ষার ব্যর্থতার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন।

কাশীরাম দাস তাঁর অনুবাদে দেখিয়েছেন শ্বেতকী রাজার যজ্ঞে বারো বছর ধরে হবি পান করে অগ্নিদেবের ক্ষুধামান্দ্য হলে খাণ্ডব দহন করে তার থেকে মুক্তি পেতে চান। কিন্তু খাণ্ডববনস্থ পশুদের বিরোধিতায় অগ্নির প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয়। শত শত হস্তি-হস্তিনী, নাগ প্রভৃতি জল ছিটিয়ে অগ্নির প্রচেষ্টা ব্যর্থ করতে সমর্থ হন। কৃষ্ণ ও অর্জুনের সাহায্যে অগ্নি খাণ্ডব দহন করতে সমর্থ হন। সমগ্র বন জুড়ে পর্বতের সমান আগুনের শিখা ওঠে, প্রলয়ের মেঘ যেমন করে ডাকে তেমন করে গাছপালা পুড়তে থাকে। প্রাণ বাঁচাতে যে যেখানে পারে পালায়। মানুষের মতোই তারা মৃত্যুর আগে শেষবারের জন্য পরস্পকে আলিঙ্গন করে ভয়ঙ্কর মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ায়। মানবস্বভাব আরোপিত অসহায় প্রাণীকুলের নিদারুণ দহন চিত্র নির্মিত হয়,রক্ষা পায়না বনবাসীগণও -

"শতক যোজন বল খাণ্ডব বিস্তার।
লাগিল অনল, উঠে পর্ব্বত আকার।।
... ...
নানা জাতি পশু পোড়ে, নানা পক্ষিগণ।
নানা জাতি পুড়িয়ে মড়য়ে নাগগণ।।
... ...
ভার্য্যা পুত্র সহ কেহ করে আলিঙ্গন।
ব্যাকুল হইয়া কেহ করয়ে রোদন।।
শ্রীঘ্রগতি গিয়া কেহ পড়ে জলমাঝে।
জলজন্তু সহ ভস্ম হয় অগ্নিতেজে।।
জলেতে পুড়িয়ে মরে শফরী কচ্ছপ।
বনেতে পুড়িয়ে মরে বনবাসী সব।।"[৯]

প্রজ্জ্বলিত খাণ্ডববনের বর্ণনা যেভাবে এখানে কাশীরাম দিয়েছেন মধ্যযুগের শেষ পর্বের অনুবাদক মল্লভূমের কবি শংকর কবিচন্দ্রের অনুবাদে তা নেই। আবার পলায়নপর পশুপাখির চিত্র আঁকতে গিয়ে কাশীরাম যেভাবে কৌতুক রস মিশিয়ে দিয়েছেন, কালীপ্রসন্ন যেভাবে পশুপাখির মধ্যে মানবস্বভাব আরোপ করেছেন তাও কবিচন্দ্রের অনুবাদে নেই।কবিচন্দ্রে অনেকবেশি আছে খাণ্ডব দহন নিয়ে অর্জুনের সঙ্গে দেবতাদের যুদ্ধের কথা। দহনকালে পলায়নপর পশুপাখির চিত্র কবিচন্দ্র যেমন এঁকেছেন-

"নরনারায়ণ দোঁহে হল্যা দুই রথী।
পোড়ায় খাণ্ডববন অগ্নির পিরিতী।।
ভয়ে ভার্য্যা সহ সুত রাখি তক্ষক পালাল্য।
শিশুপুত্রে স্নেহে সর্পী ভাবিতে লাগিল।।
পক্ষী রূপে পুত্রে মাতা মুখে করি যায়।"[১০]

কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর অনুবাদে দহনকালীন খান্ডববনের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে সূর্যকিরণে ব্যাপ্ত মেরু প্রদেশের তুলনা দিয়েছেন, বরফের উপর সূর্যকিরণ পড়ে যে স্বর্ণবর্ণ ধারণ করে এখানে তা বলা হয়েছে –

"ঘনঘটার গভীর নির্ঘোষের ন্যায় প্রজ্জ্বলিত অনলের শব্দ শ্রবণে সমস্ত জীবজন্তু কম্পান্বিত কলেবর হইল।খাণ্ডবারণ্য হুতাশন কর্তৃক দাহ্যমান হইয়া সূর্যকিরণে ব্যাপ্ত পর্বতেন্দ্র মেরুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।"[১১]

দহন কালে পলায়নপর জন্তুদের চিত্র আঁকতে গিয়ে কাশীরাম দাস স্বভাবসুলভ কৌতুক পরিহার করতে পারেননি, কিন্তু কালীপ্রসন্নের ভাষার দৃঢ়তাবশত বর্ণনা ভয়ঙ্কর হয়েছে -

> "কেহ কেহ পিতাপুত্র ও ভাতৃগণকে আলিঙ্গন করিয়া স্নেহবশতঃ তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে না পারায় তথায় প্রাণত্যাগ করিল। কেহ কেহ দশনে দশন নিষ্পীড়ন পূর্বক ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল এবং বিঘূর্ণিত কলেবর হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। পক্ষীগণ দগ্ধপক্ষ, দগ্ধচক্ষু ও দগ্ধচরণ হইয়া মহীতলে বিলুণ্ঠন পূর্বক প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। জলাশয় সকল তীব্রতাপে ক্বাথ্যমান হওয়াতে তত্রস্থ কূর্ম ও মৎস্য সমুদায় বিনষ্ট হইয়া গেল।। ...তাহাদের ঘোরতর নিনাদ মধ্যমান সমুদ্রের গভীর শব্দের ন্যায় শ্রুত হইতে লাগিল।"[১২]

খাণ্ডব দহনকালীন পলায়নপর পশুপাখির এই যে চিত্র তা পরবর্তী অনুবাদক রাজশেখর বসুর অনুবাদে নেই।অর্জুন ও কৃষ্ণের সহায়তায় অগ্নি কীভাবে খাণ্ডববন দহন সম্পূর্ন করলেন তার কথা আছে –

> "কৃষ্ণার্জুন দুই রথে আরোহণ করলে অগ্নি খান্ডববন দগ্ধ করতে লাগলেন। পশুপক্ষী চিৎকার করে পালাতে গেল, কিন্তু অর্জুনের বাণে বিদ্ধ হয়ে অগ্নিতে পড়ল, কোন প্রাণী নিস্তার পেল না। অগ্নির আকাশস্পর্শী শিখা দেখে দেবতারা উদবিগ্ন হলেন। ইন্দ্র আদেশে মেঘ থেকে সহস্রধারায় জলবর্ষন হতে লাগল; কিন্তু অগ্নির তেজে তা আকাশেই শুকিয়ে গেল। ...অবশেষে ইন্দ্র পর্বতের একটি বিশাল শৃঙ্গ উৎপাটিত করে অর্জুনের প্রতি নিক্ষেপ করলেন। অর্জুনের বাণে পর্বতশৃঙ্গ শহস্র খণ্ড হয়ে খাণ্ডববনে পড়ল, অসংখ্য প্রাণী নিহত হল।"[১৩]

আমরা লক্ষ্য করি মানব সভ্যতার অগ্রগতির পথকে বিস্তার দিতেই অরণ্য ও আরণ্যক জীবনের ক্রম হ্রাসমান চিত্র এবং কৃষি ও নাগরিক সভ্যতার বিস্তার। এটাই আমাদের নিয়তি। কিন্তু মহাভারতে একটা অন্য ছবিও আছে যেখানে দেখা যায় ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক অর্ধরাজ্য প্রাপ্তির পর পাণ্ডবরা খাণ্ডবপ্রস্থকে ইন্দ্রপ্রস্থে পরিণত করেন যা কম বিস্ময়কর নয়। অরণ্য ধ্বংসের পর যে নগর গঠিত হল তা নিসর্গ সজ্জিত হয়ে অরণ্য ধ্বংসের পরিপূরক হয়ে উঠেছে। গাছ-গাছালি, ফুল-ফল, পাখিতে মুখরিত হয়ে উঠল নগর। কাশীরাম দাসের অনুবাদের ২২০ পৃষ্ঠায় দেখি এই বিবরণ -

> "স্থানে স্থানে নগরে রোপিল বৃক্ষগণ।
> পিপ্পলী কদম্ব আম্র পনস কানন।।
> ... ...
> কদলী গুবাক নারিকেল সুখর্জ্জুর।
> নানাবর্ণে বৃক্ষ শোভে যেন সুরপুর।।
> স্থানে স্থানে খোদাইলো দীঘি পুষ্করিণী।
> জলচর পক্ষিগণ সদা করে ধ্বনি।।"

আরও একটা দিক লক্ষ্যণীয় যে অনুবাদক বাঙালি বলেই রোপিত বৃক্ষের বেশিরভাগই এই বঙ্গের পরিচিত বৃক্ষমালা।

কুরুক্ষেত্র বর্ণনা :

থানেশ্বরের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত কুরুক্ষেত্র ছিল দেবতাদের যজ্ঞস্থান। রাজর্ষি কুরু পুরাকালে এই স্থানটি সর্বদা কর্ষণ করতেন এই ভেবে যে, এখানে যারা মারা যাবে তারা পাপবিমুক্ত হয়ে পুণ্যলোকে যাবে। কিন্তু ইন্দ্র কুরুকে এই কাজে নিবৃত্ত করেন কেননা এখানে মরে সকলেই তাহলে স্বর্গে যাবে। যাইহোক সেই কুরুক্ষেত্রই হয়ে উঠল ১৮ দিনের কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের রক্তাক্ত ক্ষেত্র। মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যে বিবরণ মেলে তা দিন-রাত, ঝড়-বৃষ্টি, গোধূলি, গভীর নিশীথের এক ভয়ঙ্কর লীলাক্ষেত্র।

কাশীরাম দাস উদ্যোগ পর্বে কুরুক্ষেত্রের উৎপত্তির কাহিনি যেভাবে বর্ণনা করেছেন তাতে প্রকৃতি প্রসঙ্গ বিস্তর আছে, কুরুরাজের মৃগয়া প্রসঙ্গে দন্ডক কাননের বর্ণনা আছে –

> "দণ্ডক কাননে রাজা হৈল উপনীত।।
> মুনির আশ্রমে সেই অপূর্ব কানন।
> মনুষ্য-অগম্য স্থল, অতি সুশোভন।।
> দিব্য সরোবর আছে বনের ভিতর।

দেবকন্যাগণ তাহে নিত্য ক্রীড়া করে।।"[১৪]

এই আশ্রমেই রাজা দেব নর্তকী বহুরূপার দেখা পায়, যাকে পাবার জন্যে তিনি ব্যকুল অথচ শর্তভঙ্গ করে পেয়েও হারালেন। শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রের আরাধনা করে ফিরে পেলেন তাকে, সঙ্গে কুরুক্ষেত্রের ধার্মিক মহিমা লাভের বর। বহুরূপার রূপ যেভাবে কাশীরাম দাস এঁকেছেন তার সবটাই নিসর্গাশ্রয়ী –

"বহুরূপা নামে কন্যা দেবের নর্ত্তকী।
রূপেতে কনকলতা খঞ্জন-নয়নী।।
মুখরুচি শত শশী করিয়াছে শোভা।
ওষ্ঠস্থল অতুল বন্ধুক পুষ্প-আভা।
শুকচঞ্চু জিনি নাসা, জিনি তিলফুল।
বঙ্কিম যুগল ভুরু, কিবা দিব তুল।।"[১৫]

অসামান্য রূপসী এই দেব কন্যাকে দেখে মুগ্ধ রাজা কুরু পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে বহুরূপা যেভাবে পূর্জন্মের কথা বলেছেন তাতে বিবরিত হয়েছে একটি পাখির জীবনকাল। ইন্দ্রের নর্তকী বহুরূপা গতজন্মে ছিল পক্ষী- সারঙ্গিনী। প্রভাস নদীতীরে প্রমাথিক নামক বটগাছে ছিল তার বাসা। নিসর্গকে বিশিষ্টতা দিতেই নদী, পাখি, বটগাছের নির্দ্দিষ্ট নাম দেওয়া হয়েছে। নদীতট, বটবৃক্ষ, পাখির বাসা নিসর্গের কেন্দ্রে অবস্থান করেছে -

"তথা অবস্থিতি আমি করি বহুকাল।
কতদিনে বৃদ্ধকাল হইল জঞ্জাল।।
জড়াতে আতুর তনু, ব্যাধিতে পীড়িল।
সেই বৃক্ষ উপরেতে মম মৃত্যু হৈল।।
মরিয়া শুকায়ে ছিনু বাসার ভিতরে।
বহুকাল ছিল বাসা বৃক্ষের উপরে।।
দৈবের নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম না হয় খণ্ডন।
কতদিনে ঘোরতর বহিল পবন।।
বাসার সহিত মম শুষ্ক কলেবরে।
উড়াইয়া ফেলিলেক প্রভাসের নীরে।।
পরশ করিতে অঙ্গ প্রভাসের পাণি।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হইলাম নৃপমণি।।"[১৬]

এই বহুরূপাকে পেয়ে রাজা পরবর্তীতে যখন হারালেন তখন যে স্থানে তপস্যা করে ইন্দ্রের বরলাভ করলেন তাই কুরুক্ষেত্র -

"হস্তিনার উত্তরেতে সরস্বতী তীরে।
উপবন আছে যথা তাহার উত্তরে।।
নিত্য আসি সুরধেনু চরে সেই বনে।
ইন্দ্র আরাধনা করে সুরভি সেবনে।।[১৭]

কাশীরাম দাস তাঁর অনুবাদে যেভাবে কুরুক্ষেত্রের উৎপত্তির কথা এবং প্রসঙ্গক্রমে দণ্ডকারণ্যের বর্ণনা দিয়েছেন শংকর কবিচন্দ্রের অনুবাদে তা অনুপস্থিত। কিন্তু কাশীরাম দাস যুদ্ধের পর ভয়াল প্রকৃতির যেমন করে উপস্থাপনা করেছেন কবিচন্দ্রের অনুবাদে তা হাজির –

"কার হাত কাটা গেছে কার পা।
অগম্য ধরণীতল গায়ের উপর গা।।
শৃগাল কুক্কুরে কারে টানাটানি করে।
... ...
... ...
শৃগাল কুকুর যত করে লাফালাফি।"[১৮]

যুদ্ধ শেষ হয়েছে, সমগ্র কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে মানুষের কাটাহাত পা ছড়িয়ে আছে, শেয়াল কুকুরে সেসব টানাটানি করছে, কাশীরাম দাসের অনুবাদের 'স্ত্রী' পর্বেও এমন ভয়ঙ্কর প্রকৃতির সম্মুখীন হই আমরা –

"মহাভয় উপজিল দেখি রণস্থল।
... ...
হাতে মুণ্ডু করে নাচে যত ভুতগণ।
... ...
রক্তের কর্দ্দমে শীঘ্র চলিতে না পারে।
শোকাকুলা নারীগণ যায় ধীরে ধীরে।।"[১৯]

যুদ্ধ শেষে এই ভয়াল পরিবেশ যে অবশ্যম্ভাবী ছিল তা কবিচন্দ্র তাঁর অনুবাদের প্রথম অংশেই আভাস দিয়েছিলেন-

"পার্থ বাণ পড়ে সেনা নাহিক অবধি।
মাংসেতে কর্দ্দম হল্য রক্তে বহে নদী।।
... ...
... ...
শৃগাল কুক্কুর কত রক্তে সাঁতরিল।
অর্জুনের বাণে কত সেনা ভঙ্গ দিল।।"[২০]

এই ভীষন ভয়াল কুরুক্ষেত্রকেই কাশীরাম কুরুরাজের চাষের জমি হিসাবে দেখিয়ছিলেন, রাজা হাল চালিয়ে ভূমিকে যজ্ঞের স্থান হিসাবে পরিণত করতে চান -

"বৃহৎ লাঙ্গুল এক স্কন্ধে লয়ে রাজা।
নিল দুই বৃষ নিজ যুড়িয়ে লাঙ্গলে।
প্রহর পর্যন্ত চষে মহা কতূহলে।"[২১]

কালীপ্রসন্ন তাঁর অনুবাদে হাল-বলদ চাষবাসের কথা লেখেননি তবে কুরুরাজের ভূমিকর্ষণের কথা আছে -

"অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন অমিততেজা কুরুরাজ ঐ স্থানকর্ষণ করিয়াছিলেন উহা কুরুক্ষেত্র নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।"[২২]

কিন্তু কাশীরাম যেখানে কুরুক্ষেত্রের উৎপত্তি প্রসঙ্গে অপ্সরা বহুরূপার কথা বলেছেন, কালীপ্রসন্নের অনুবাদে সেরকম কোন নৈসর্গিক যোগাযোগা লক্ষিত হয় না। যুদ্ধান্তে কুরুক্ষত্রের ভয়াল পরিবেশ রচনায় অবশ্য কালীপ্রসন্ন পূর্বসুরী অনুবাদকদের পথেই চলেছেন, 'স্ত্রী' পর্বে কালীপ্রসন্ন লিখেছেন –

"অনাথা কৌরব বণিতাগণ কুরুক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন তাঁহাদের কাহারও ভ্রাতা, কাহারও পুত্র, কাহারও পিতা, কাহারও ভর্তা, প্রাণ পরিত্যাগপূর্বক ভূতলে শয়ন রহিয়াছেন। গোমায়ু, বক, বায়স, ভূত, পিশাচ ও রাক্ষসগণ পরমানন্দে সেই সমস্ত ব্যক্তিদিগের ভক্ষণ করিতেছে। ...ভয়ঙ্কর জম্বুকগণ বারংবার ভীষণ চিৎকারে, উহাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে... সখড়গ বাহু, কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ও মাংসশোণিতসঞ্জাত কর্দ্দমে রণভূমি নিতান্ত দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে।"[২৩]

রাজশেখর বসুর অনুবাদে পূর্বসুরী অনুবাদকদের ন্যায় কুরুক্ষেত্রের পরিবেশ ততটা শৃগাল-কুকুর, পিশাচের বিচরণে ভয়াবহ হয়নি। শ্রী বসু বরঞ্চ শোকের গভীরতা প্রকাশে অনেকবেশি মনোনিবেশ করেছেন– 'স্ত্রী' পর্বে গান্ধারী কুরুক্ষেত্র দর্শনের যে বিবরণ দিয়েছেন সেখানে গান্ধারীর মনোজগত উদ্ভাসিত হয়েছে-

"ঔ দেখ আমার পুত্র দুর্মুখের মুখমণ্ডলের অর্ধভাগ ভক্ষণ করেছে। কেশব, লোকে যাকে অর্জুন বা তোমার চেয়ে অধিক শৌর্যশালী বলত সেই অভিমন্যু ও নিহত হয়েছেন, বিরাট দুহিতা বালিকা উত্তরা শোকে আকুল হয়ে পতির গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। উত্তরা বিলাপ করে বলেছেন, বীর তুমি আমাদের মিলনের ছমাস পরেই নিহত হলে। ওই দেখ মৎস্যরাজের কুলস্ত্রীগণ অভাগিনী উত্তরাকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। হায়, কর্ণের পত্নী জ্ঞানশূণ্য হয়ে ভূতলে পড়ে গেছেন, আমার কন্যা দুঃশলা তার পতির মস্তক না পেয়ে চারিদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে।"[২৪]

আধুনিক সাহিত্যের শর্ত মেনে রাজশেখর বসুর রচনায় শোকার্ত মানুষের মনোপ্রকৃতির প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু ব্যাস দেব ও অন্যান্য অনুবাদকগণ যেভাবে রক্তমাংসে ভিজে ওঠা কুরুক্ষেত্রের ভয়াল পরিবেশকে রূপ দান করেছে তা মহাভারতের নিসর্গকে কাঠিন্য প্রদান করেছে তেমনি এর ধ্রুপদীয়ানাকে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে।

জয়দ্রথ বধ :

জয়দ্রথ বধ মহাভারতের বিশেষ একটা ঘটনা, কেননা কৃষ্ণ নৈসর্গিক পরিবর্তন ঘটিয়ে জয়দ্রথকে বধ করেন। অর্জুন প্রতিজ্ঞা করেছিল অভিমন্যুবধের পরদিন সূর্যাস্তের পূর্বেই সিন্ধুরাজ, দুঃশলার স্বামী জয়দ্রথকে বধ করবে আর ব্যর্থ হলে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করে প্রাণত্যাগ করবে। পরদিন যুদ্ধক্ষেত্রে জয়দ্রথ গুপ্তভাবে অবস্থান করলে যেহেতু সূর্যাস্ত আসন্ন তাই কৃষ্ণ যোগবলে সূর্যকে আচ্ছাদিত করে দিবসে সন্ধ্যার সৃষ্টি করে। জয়দ্রথ বার হয়ে এলে আবার দিনে আলো ফুটে ওঠে এবং অর্জুন সেই সুযোগে তাকে হত্যা করে। কিন্তু দৈববাণী ছিল যে রণস্থলে জয়দ্রথের মুণ্ডুচ্ছেদ করার পর তা ভূমিতে পড়লে শতধা বিদীর্ণ হবে। কাজেই পতনোন্মুখ মুণ্ডটিকে আবার কয়েকটি বাণ মেরে তা জয়দ্রথের পিতা, সন্ধ্যা বন্দনারত রাজা বৃদ্ধক্ষেত্রের ক্রোড়ে ফেলা হয়। রাজা উঠে দাঁড়াতে সেটি মাটিতে ফাটে এবং পুত্রের ছিন্নমুণ্ড শতধা বিদীর্ণ হয়ে পিতারও মৃত্যু ঘটায়। ব্যাস এবং অনুবাদকদের কলমে এই সন্ধ্যার বৈচিত্রময় পরিবেশ দেখানোই আমাদের লক্ষ্য।

কাশীরাম দাসের অনুবাদে আছে, জয়দ্রথকে বধ করার জন্য কৃষ্ণ সূর্যকে সুদর্শন চক্র দ্বারা আচ্ছাদিত করেন, সঙ্গে সঙ্গে দিবসকালে রাত্রির আগমন হল, কুরুসৈন্যরা জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলো, এবার অর্জুন কী করবে? সূর্য অস্ত গিয়েছে জেনে জয়দ্রথ বেরিয়ে এলে ব্যূহ থেকে। ঠিক সেই সময়ে সূর্যের আচ্ছাদন সরিয়ে দিলেন কৃষ্ণ, দেখা গেল বেলা তখন দুদণ্ড বাকি আছে। কিন্তু জয়দ্রথ তো এখন ব্যূহের বাইরে, হত্যা করলেন অর্জুন জয়দ্রথকে। পুরো ঘটনা থেকে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহনের কথা মনে হয়। যা এক মহাজাগতিক বিস্ময়, প্রকৃতির খেলা –

"এত বলি সদুপায় চিন্তি নারায়ণ।
সুদর্শন করিলেন সূর্য্য আচ্ছাদন।।
আচম্বিতে দেখে সবে হইল রজনী।
কুরুসৈন্যগণে হৈল জয় জয় ধ্বনি।
জয়দ্রথ দেখি কৃষ্ণ আনন্দিত মন।
সেই ক্ষণে ছাড়িলেন সূর্য্য আচ্ছাদন।।
দুই দণ্ড বেলা আছে গগন-মণ্ডলে।
... ...
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, সখে সাবধানে শুন।
জয়দ্রথ বধিবারে দেরী আর কেন।"[২৫]

কবিচন্দ্রের এই অংশের বর্ণনা কাশীরাম দাসের অনুরূপ। অর্জুন জয়দ্রথকে সূর্যাস্তের আগে যাতে বধ করতে পারে সেজন্য কৃষ্ণ সূর্যকে আচ্ছাদিত করলেন। এদিকে সূর্যাস্ত হয়েছে ভেবে জয়দ্রথ ব্যূহ থেকে বেরিয়ে আসলে কৃষ্ণ পুনরায় সূর্যকে মুক্ত করে দিলেন–

"অর্জুন ডাকিয়ে বলে কি হল্য গৌসাঞি।
কোথা গেল জয়দ্রথ দেখা নাই পাই।।
ঘোর অন্ধকার সৃষ্টি কৈল নারায়ণ।
দীপ্তি নাঞি করিলেন সূর্য আবরণ।।
... ...
ব্যূহ ভাঙা গেল জয়দ্রথ বাহিরায়।।
অন্ধকার ঘুচাইয়া দিল নারায়ণ।।
ঝলমল করে ওঠে রবির কিরণ।
এতগুনি, দিব্য অস্ত্রে পুরিল সন্ধন।

মাথা কাটা রক্ষ অস্ত্রে গগনে উড়ান।"[২৬]

কালীপ্রসন্ন সিংহ দেখিয়েছেন অর্জুন যখন কৌরব সৈন্যদির ব্যূহ ভেদ করে জয়দ্রথকে হত্যা করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তখন কৃষ্ণ বলেন একমাত্র অন্ধকার করে দিলেই সবাই ভাববে যুদ্ধ শেষ, জয়দ্রথকে কেউ রক্ষা করবে না। সেই সময় সহজেই জয়দ্রথকে বধ করা সম্ভব হবে। কৃষ্ণ যোগমায়া সৃষ্টি করে সূর্যকে ঢেকে দিলেন। অর্জুন অন্ধকার কাটতে না কাটতেই জয়দ্রথকে হত্যা করলেন, তারপর আবার আকাশে সূর্যদেব দেখা দিলেন –

> "অনন্তর মহাত্মা কৃষ্ণ যোগমায়া প্রভাবে সৃষ্টি করলেন। দিবাকর তিরোহিত হইল। কৌরব পক্ষীয় বীরগণ অর্জ্জুন বিনাশাথ সাতিশয় হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন বাসুদেব পুনরায় অর্জ্জুনকে কহিলেন 'হে অর্জ্জুন! ঐ দেখ জয়দ্রথ নিঃশঙ্কচিত্তে দিবাকরের প্রতি দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিতেছে, উহাকে সংহার করিবার এই উপযুক্ত অবসর। ...হে মহারাজ! এইরূপে অর্জ্জুনশরে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ নিহত হইলে মহাত্মা কৃষ্ণ অন্ধকার প্রতিসংহার করলেন। তখন আপনার পুত্রগণ সেই বাসুদেবকৃত মায়াজাল বিস্তারের বিষয়ে সম্যক অবগত হইলেন।"[২৭]

রাজশেখর বসুর অনুবাদে এই অংশের যে নৈসর্গিক পরিবর্তন আছে তা কালীপ্রসন্নের অনুবাদের সদৃশ অর্থাৎ এখানেও জয়দ্রথ বধের পর কৃষ্ণ অন্ধকার অপসারিত করেন –

> "যোগীশ্বর হরি যোগমুক্ত হয়ে সূর্যকে তমসাছন্ন করলেন। সূর্যাস্ত হয়েছে, এখন অর্জুন অগ্নিপ্রবেশ করবেন এই ভেবে কৌরবরা হৃষ্ট হলেন। জয়দ্রথ উর্দ্ধমুখে সূর্য দেখতে পেলেন না। কৃষ্ণ বললেন, অর্জুন জয়দ্রথ ভয় মুক্ত হয়ে সূর্য দেখছেন; দুরাত্মাকে বধ করবার এই সময়। ...ধূলি ও অন্ধকার চর্তুদিকে আচ্ছন্ন হওয়ায় কেউ কাউকে দেখতে পেলেন না, অশ্বারোহী গজারোহী ও পদাতি সৈন্য অর্জুনের বাণে বিদারিত হয়ে পালাতে লাগলেন। কৃষ্ণ পুনর্বার বললেন, অর্জুন জয়দ্রথের শিরশ্ছেদ করো, সূর্য অস্ত যাচ্ছেন। ...তারপর কৃষ্ণ অন্ধকার অপসারিত করলেন।"[২৮]

মহাভারতে নিসর্গের এই যে মহাজাগতিক বিস্তার তা এর ধ্রুপদীয়ানাকে ধরে রেখেছে নিঃসন্দেহে। আবার দ্রোণ পর্বে যুদ্ধক্লান্ত কুরুক্ষেত্রে চন্দ্র উদয়ের কথা প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে যা এর নিসর্গকে ভিন্ন রোমান্টিকতা দান করেছে। এ এক অদ্ভুত নৈসর্গিক দৃশ্য। চাঁদ ওঠার সাথে সাথেই ফুটফুটে চাঁদের আলোয় সমগ্র কুরুক্ষেত্রে যেন দিনের আলো ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। পদ্মফুলের যেমন ঘুম ভাঙ্গে সূর্যের প্রথম কিরণে তেমনি যুদ্ধক্লান্ত সৈন্যরা জেগে উঠেছে চাঁদের আলোয়-

> "হরবৃষোত্তম গাত্র সমদ্যুতিঃ স্মরশাসনপূর্ণ সমপ্রভাঃ।
> নববধূস্মিত চারু মনোহরঃ প্রবিসৃতঃ কুমুদকরবান্ধবঃ।।"[২৯] (দ্রোণ, ১৫৭, ৮৭)

বাংলায় অনূদিত মহাভারতগুলিতে নিসর্গপ্রকৃতির তারতম্যের স্বতন্ত্রতা বিশ্লেষণে অন্যান্য যে নৈসর্গিক দৃশ্যগুলি অনুল্লেখিত রয়ে গেল সেগুলি যথা- সমুদ্রমন্থন, গজকচ্ছপের বিবরণ, মৎস্যগন্ধার উৎপত্তি ও ব্যাসদেবের জন্ম, পাণ্ডবদের বারণাবত গমন, জতুগৃহ দাহ, পাণ্ডবদের নিকট হিড়িম্বার আগমন, অর্জুন কর্তৃক সুভ্রদা হরণ, রাজসূয় যজ্ঞ, বাসুকী নিমন্ত্রণে অর্জুনের পাতাল প্রবেশ, যুধিষ্টিরের বনগমন, সাবিত্রী সত্যবান অংশ, শাম্ব প্রসঙ্গ ইত্যাদি।

উল্লেখিত অংশগুলির আলোচনায় আমরা দেখলাম মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন অনুবাদ গুলির অনুবাদের তাৎপর্যময় স্বতন্ত্রতা। মধ্যযুগীয় সাহিত্যে নিসর্গ যে উদ্দীপন বিভাবের ভূমিকা নিয়ে থাকে তা অনূদিত গ্রন্থগুলিতে বিদ্যমান। আধুনিক যুগের পাশ্চাত্যপ্রভাব থেকেই হয়ত আধুনিক গদ্য অনুবাদে নিসর্গের মানবস্বভাব আরোপ, অতিপ্রাকৃতধর্মী নৈসর্গিক বর্ণনার প্রসার ঘটেছে। শাম্ব প্রসঙ্গ, মুষল পর্বে আমরা এই অতিপ্রাকৃতধর্মী নিসর্গ বর্ণনা লক্ষ্য করি। এছাড়াও নিসর্গের ভিন্নতর উপস্থিতিও রয়েছে যেমন কখনো নিসর্গ ঘটনাপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, কখনো নিসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে যুদ্ধাস্ত্র হিসাবে, কখনো বা প্রকৃতি ধ্বংসের বিরুদ্ধে প্রশ্নচিহ্ন রেখেছে, কখনো নাটকীয় পট পরিবর্তনে ভুমিকা গ্রহণ করেছে। তেমনি নগর নির্মাণ ও অরণ্য ধ্বংসের যে চালচিত্র আধুনিক সভ্যতার নিয়তি তার সূচনাও বোধহয় এখান থেকেই। মানুষ ও প্রকৃতির চিরকালীন ও চিরনবীন যে সম্পর্ক ক্লাসিক্যাল সাহিত্যে বা রোমান্টিক সাহিত্যে বিস্তারলাভ লাভ করে সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে তা যেমন অনূদিত মহাভারতগুলিতে পাওয়া যাবে তেমনি কোমল এবং কঠিনের সমন্বয়ে গড়া যে মহভারতীয় নিসর্গ তাও এখানে লক্ষ্যমান। মহাভারতে যা নেই তা নেই অন্য কোথাও স্বভাবতই এ কথার সঙ্গতি রেখে নিসর্গের পূর্ণস্বরূপের সন্ধানে আমাদের মহাভারতের দ্বরস্থ হতেই হয়।

তথ্যসূত্র :

১. মহাভারত কথা, স্বামী তথাগতানন্দ, মহাভারতের মর্মবাণী, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, পৃ. ঞ
২. মহাভারত কথা, স্বামী তথাগতানন্দ, বনবাসের শুভফল, ঐ, পৃ. ১০৯
৩. কেন প্রামাণ্য মহাভারত, কেনই বা বাঙালী, গৌতম চক্রবর্তী, আনন্দবাজার পত্রিকা, সম্পাদকীয়
৪. কাশীদাসী মহাভারত, শ্রী বেণীমাধব শীল সম্পাদিত, অক্ষয় লাইব্রেরী, কলকাতা-০৯, পৃ. ৭২
৫. কাশীরাম, ঐ, পৃ. ৭৩
৬. কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত মহাভারত, রাজ সংসস্করণ, তুলিকলম, কলকাতা-০৯, পৃ. ১২২
৭. কালীপ্রসন্ন, ঐ, পৃ. ১২০
৮. মহাভারত সারানুবাদ, রাজশেখর বসু, এম.সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স, কলকাতা-৭৩, পৃ. ৩৫
৯. কাশীরাম, ঐ, পৃ. ২৫৭
১০. শংকর কবিচন্দ্রের মহাভারত, চিত্রা দেব সম্পাদিত, সাহিত্যলোক, কলকাতা-০৬, পৃ. ৯৪
১১. কালীপ্রসন্ন সিংহ, ঐ, পৃ. ২৭৪
১২. কালীপ্রসন্ন, ঐ, পৃ. ২৭৪
১৩. রাজশেখর, ঐ, পৃ. ৯৮-৯৯
১৪. কাশিরাম, ঐ, পৃ. ৬৪১
১৫. কাশীরাম, ঐ, পৃ. ৬৪১
১৬. কাশীরাম, ঐ, পৃ. ৬৪১
১৭. কাশীরাম, ঐ, পৃ. ৬৪২
১৮. কবিচন্দ্র। ঐ, পৃ. ২২৪
১৯. কাশীরাম, ঐ, পৃ. ৯২৮
২০. কবিচন্দ্র, ঐ, পৃ. ১৭৭
২১. কাশীরাম, ঐ, পৃ. ৮৯১
২২. কালীপ্রসন্ন, ঐ, পৃ. ৪৮১
২৩. কালীপ্রসন্ন, ঐ, পৃ. ৫২৮-২৯
২৪. রাজশেখর, ঐ, পৃ. ৫৫১
২৫. কাশীরাম, ঐ, পৃ. ৮০৩
২৬. কবিচন্দ্র, ওই, পৃ. ১৯৯-২০০
২৭. কালীপ্রসন্ন, ঐ, পৃ. ২০০-২০০২
২৮. রাজশেখর, ঐ, পৃ. ৪৪৪
২৯. জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার, পৃ. ৩৬৭